চতুর্থ অধ্যায়

অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবন, শিক্ষা ও ধর্মীয় বিশ্বাস

(খ্রিঃ ৮০০-১২০০)

খ্রিস্টীয় এগারো থেকে তেরো শতকের মধ্যে উত্তর ভারতের রাজনৈতিক বিকাশ সম্বন্ধে পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে। এই অধ্যায়ে খ্রিস্টীয় নয় শতক থেকে তেরো শতক পর্যন্ত এই চারশত বছরকে একসঙ্গে ধরে ঐ সময়ে ভারতীয় জনসাধারণের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবন, তাদের শিক্ষা ও ধর্মীয় বিশ্বাস কি ছিল তা আলোচনা করা যাক। মানুষের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবন, তার ধ্যান-ধারণা বিশ্বাস সব কিছুর পরিবর্তন হয় তার রাজনৈতিক জীবন অপেক্ষা অধিকতর শ্লথগতিতে। খ্রিস্টীয় ন শতকের পূর্বে সমাজজীবনের প্রচলিত বহু বৈশিষ্ট্য পরবর্তীকালেও বর্তমান ছিল। আবার সেই সঙ্গে সমাজজীবনে বেশ কয়েকটি নূতনত্বেরও আমদানী হলো। ফলে পূর্ববর্তী যুগ থেকে পরবর্তী যুগকে পৃথক করে নিতে কষ্ট হয় না। মোট কথা, প্রত্যেক ঐতিহাসিক যুগে নূতন ও পুরাতন ভাবধারার সংমিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়। তবে প্রত্যেক যুগের পরিবর্তনের ধারা ও বিস্তৃতি ভিন্ন ধরনের হয়।

ব্যবসা ও বাণিজ্য

উত্তর ভারতে এ যুগটা ছিল গতিরুদ্ধ জড়ত্বের যুগ, অবক্ষয়ের যুগ। এর প্রধান কারণ হলো খ্রিস্টীয় সাত থেকে দশ শতকের মধ্যে ভারতীয় ব্যবসা বাণিজ্যের ক্রমাবনতি। আবার ব্যবসা-বাণিজ্যের অবনতিতে উত্তর ভারতের শহর ও শহর জীবন ক্রমে ম্লান হয়ে এল। প্রধানতঃ পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যের পতনের ফলে ভারতীয় ব্যবসা-বাণিজ্যের অবনতি ঘটে কেননা পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যের সঙ্গে ভারতের বেশ উন্নত ও লাভজনক ব্যবসা চলতো। ভারতের সোনা ও রূপার খনি থেকে কখনো প্রচুর সোনা ও রূপা পাওয়া যেত না। তবে যে সোনা রূপার প্রাচুর্যের জন্য ভারত

Scanned by CamScanner

খ্যাতি লাভ করেছিল তা আসতো ভারতের অনুকূল বাহির্বাণিজ্য থেকে. বিদেশীদের সঙ্গে বাণিজ্যের মুনাফাটা আসতো আমাদের দেশে সোনা রূপার মাধ্যমে। তাছাড়া ইসলামের উত্থানে সাসানিদ (ইরাণীয়) প্রমুখ প্রাচীন সাম্রাজ্যগুলির ধ্বংসের ফলে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য বিশেষ করে স্থলপথে বহির্বাণিজ্য কম ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। এর ফলে খ্রিস্টীয় আট থেকে দশ শতকের মধ্যে উত্তর ভারতে স্বর্ণমুদ্রার বিশেষ রকমের ঘাটতি হলো। যাই হোক, পশ্চিম এশিয়া ও উত্তর আফ্রিকায় শক্তিশালী ও সুবিস্তৃত আরব সাম্রাজ্যের উত্থানে অবস্থার ধীরে ধীরে পরিবর্তন সূচিত হলো। আরব সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে বহু সোনার খনি ছিল। তাছাড়া, আরবরা ছিল সমুদ্রনাবিক। ধনী আরবদের ভারতীয় বস্ত্র, গন্ধ দ্রব্য ও মশলার চাহিদা থাকায় ভারত ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে তাদের বাণিজ্য বৃদ্ধি পেল। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াকে 'মশলার দ্বীপ' বলা হতো। পূর্বেই বলা হয়েছে যে খ্রিস্টীয় ন ও দশ শতকে বহু আরব পর্যটক ভারতের পশ্চিম সমুদ্রবন্দরে এসেছিলেন এবং তখনকার ভারতের অবস্থা সম্পর্কে মনোজ্ঞ বর্ণনা রেখে গেছেন। এইভাবে দেখা যায় যে খ্রিস্টীয় দশ শতক থেকে উত্তর ভারতে বৈদেশিক বাণিজ্যের ধীরে ধীরে পুনরুজ্জীবন ঘটে। ফলে মালবের চম্পানীর প্রমুখ বহু শহর এই সময়ে গড়ে ওঠে।

যে সময়ের কথা বলা হচ্ছে সে সময়ে ভারতের জনসংখ্যা ১০ কোটিরও কম ছিল বা আমাদের এখানকার জনসংখ্যার এক-পঞ্চমাংশ ছিল। দেশের বিরাট অংশ ছিল শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যাবৃত। এইসব অরণ্যে বন্য উপজাতিরা বাস করতো। তারা প্রায়ই যুদ্ধপ্রিয় ছিল এবং পথিকদের লুণ্ঠন করতো। নদীতে কোনো সেতু ছিল না এবং বর্ষাকালে রাস্তা প্রায় দুর্গম ছিল। এইজন্য দেশের মধ্যে ভ্রমণ সে ব্যবসাই হোক বা প্রমোদ উপলক্ষেই হোক কখনও নিরাপদ ছিল না। নিরাপত্তার জন্য বণিকরা বা অন্যান্যরা সাধারণতঃ সৈন্য সুরক্ষিত হয়ে দলবদ্ধভাবে ভ্রমণ করতো। তা সত্ত্বেও সময়ে সময়ে দুর্ধর্ষ ডাকাতরা তাদের লুণ্ঠন করতো।

সমসাময়িক কয়েকটি গল্পের বইতে তখনকার ভ্রমণের অসুবিধার কথা নিখুঁতভাবে বর্ণিত হয়েছে আর নিজ গৃহবাসের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের স্তুতি করা হয়েছে। পল্লী অঞ্চলে জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তার অভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য হ্রাস পেল। এই সময়ে এক নূতন সমাজ-ব্যবস্থা গড়ে উঠলো। এই ব্যবস্থায় অর্থনীতির দিক দিয়ে পল্লী অঞ্চল স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে উঠলো। এই সমাজব্যবস্থাকে অনেকে সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা বলে অভিহিত করে থাকেন। অন্তর্বাণিজ্য হ্রাসের ফলে উত্তর ভারতে 'শ্রেণী' ও 'সঙ্ঘ' নামে ব্যবসায়ী সঙ্ঘ (guild) সকল ক্ষীণ হতে লাগলো। এই ব্যবসায়ী সঙ্ঘে বিভিন্ন বর্ণের লোক থাকতো। এইসব সঙ্ঘের নিজস্ব আচরণ বিধি ছিল এবং সঙ্ঘের সভ্যদের আইনতঃ সেসব বিধি মেনে চলতে হতো। তারা টাকা ধার দিতে বা ধার করতে বা

অনুদান গ্রহণ করতে পারতো। ব্যবসা বাণিজ্যের অবনতিতে এইসব সঙ্ঘের পূর্ব গৌরব হ্রাস পেতে থাকলো। এই সময়ে ব্যবসায়ী সঙ্ঘের অনুদান গ্রহণের কথা কোথাও উল্লেখ পাওয়া যায় না। কালক্রমে কয়েকটি পুরাতন 'শ্রেণী' উপবর্ণ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। যেমন 'দ্বাদশ শ্রেণী' ব্যবসায়ী সঙ্ঘ বৈশ্যদের উপবর্ণ হিসাবে পরিচিত হয়। এইসব বণিক শ্রেণী জৈনধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করতো। তাদের প্রতিপত্তি হ্রাসে জৈনধর্মের অগ্রগতিতে বাধা পড়লো।

ব্যবসা-বাণিজ্যের অবক্ষয়ের প্রতিফলন সে যুগের মানুষের চিন্তাধারাতেও পড়েছিল। এই সময়ে লিখিত কয়েকটি ধর্মশাস্ত্রে বলা হলো যে যেখানে মুঞ্জ ঘাস জন্মায় না বা যেখানে কাল মৃগ ঘুরে বেড়ায় না সেসব স্থানে অর্থাৎ ভারতের বাইরে ভ্রমণ নিষিদ্ধ। সমুদ্র পার হয়ে ভ্রমণও অপবিত্র বলে মনে করা হতো। অবশ্য এ নিষেধাজ্ঞার উপর সবাই গুরুত্ব দেয়নি। কেননা এ সময়ে বাগদাদ এবং পশ্চিম এশিয়ার অন্যান্য মুসলিম শহরে বহু ভারতীয় বণিক, দার্শনিক, চিকিৎসক ও কারিগর যাতায়াত করতেন তার বিবরণ আছে। খুব সম্ভব কেবল ব্রাহ্মণদের ক্ষেত্রেই ভ্রমণ নিষিদ্ধ ছিল অথবা পশ্চিমে ইসলাম প্রধান এবং বৌদ্ধ প্রধান দেশসমূহে অধিক সংখ্যক ভারতীয়দের গমনাগমনে উৎসাহ না দেবার উদ্দেশ্যেই এই নিষেধাজ্ঞার প্রয়োজন ছিল। কেননা ঐ সকল অঞ্চল থেকে প্রচলিত ধর্মমত বিরোধী ভাবধারার আগমনের আশংকা ছিল যা ব্রাহ্মণদের এবং শাসকগোষ্ঠীর পক্ষে অস্বস্তিকর কারণ হতে পারতো বা গ্রহণীয় না হতে পারতো।

সমুদ্র-ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞা কিন্তু দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে ও চীনে সমুদ্রপথে বহির্বাণিজ্যের প্রসারে কোন বাধার সৃষ্টি করেনি। খ্রিস্টীয় ছয় শতক থেকে আরম্ভ করে দক্ষিণ ভারত ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির মধ্যে বাণিজ্য তৎপরতা লক্ষ্য করা যায়। এই সময়কার সাহিত্যে ঐসব অঞ্চলের ক্রমবর্ধমান ভৌগোলিক জ্ঞানের পরিচয়ও পাওয়া যায়। হরিষেণের 'বৃহৎ-কথা-কোষ' প্রমুখ এই সময়কার নানা গ্রন্থে ঐসব অঞ্চলের ভাষার অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য, সেখানকার অধিবাসীদের পোশাক-পরিচ্ছদ প্রভৃতির উল্লেখ আছে। ঐসব অঞ্চলের যাদু-জলে ভারতীয় বণিকদের দুঃসাহসিক কার্য সম্বন্ধীয় নানা কাহিনীও আছে। এইসব কাহিনী সিন্ধবাদ নাবিকের সুপরিচিত কাহিনীর ভিত্তিভূমি। ঐসব দেশে বহু ভারতীয় ব্যবসায়ী বসতি স্থাপন করেছিল এবং এমন কি তাদের অনেকেই স্থানীয় পরিবারে বিবাহও করেছিল। ব্যবসায়ীদের সঙ্গে পুরোহিতরাও যেত। এইভাবে বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্মীয় ভাবাধারা ঐসব অঞ্চলে প্রবেশ করে। জাভাতে বোরোবুদুরের বৌদ্ধমন্দির এবং কাম্বোডিয়ার আঙ্কোরভাটের ব্রাহ্মণ্য মন্দির থেকে বোঝা যায় যে ঐসব অঞ্চলে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য দু ধর্মই প্রসার লাভ করেছিল। ঐসব অঞ্চলের কয়েকটি শাসক পরিবার অংশত হিন্দুধর্মাবলম্বী ছিল এবং

Scanned by CamScanner

তারা ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী ছিল। এইভাবে ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে স্থানীয় সংস্কৃতির মিলনে এক নতুন ধরনের সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক ভাবধারার জন্ম হলো।

জাভা, সুমাত্রা প্রভৃতি স্থানে সমুদ্রপথে রওনা হবার প্রধান ভারতীয় বন্দর ছিল বঙ্গদেশের তাম্রলিপ্ত। এই সময়কার বহু গল্পে দেখা যায় যে তাম্রলিপ্ত থেকে বণিকরা যাত্রা করছে সুবর্ণ দ্বীপ (আধুনিক ইন্দোনেশিয়া) অথবা কটাহ (মালবের কেদাহ) দ্বীপে। খ্রিস্টীয় চোদ্দ শতকে জাভার লেখক লিখেছেন যে সে সময়ে বড় বড় জাহাজে করে জম্বুদ্বীপ (ভারত), কর্ণাটক (দক্ষিণ ভারত) এবং গৌড় (বঙ্গদেশ) থেকে বহুলোক ঐসব দ্বীপে অবিরত আসতো। গুজরাটের ব্যবসায়ীরাও এই ব্যবসায়ে অংশগ্রহণ করতো।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বাণিজ্যিক গুরুত্ব ছিল কেবলমাত্র ঐ অঞ্চলের বাণিজ্যের জন্য নয়, চীনের সঙ্গে বাণিজ্যিক যোগাযোগের এ ছিল অত্যাবশ্যক যাত্রা বিরতির কেন্দ্রস্থল। চীনা জাহাজ সাধারণতঃ মোলাক্কা পর্যন্ত আসতো। চীন ও ভারতের মধ্যে স্থলপথে বাণিজ্য এ সময়ে তিব্বতী, তুর্কী, আরবীয় ও চীনাদের মধ্যে পরস্পর সংঘর্ষের ফলে নিরাপদ ছিল না। এর পরিবর্তে ভারত ও চীনের মধ্যে সমুদ্রপথে যোগাযোগ ব্যবস্থার গুরুত্ব বৃদ্ধি পেল। চীনের বৈদেশিক বাণিজ্যের এই সময়ের প্রধান সমুদ্র বন্দর ছিল ক্যান্টিন যাকে আরব পর্যটকরা বলতো কান্‌ফু। ভারত থেকে বৌদ্ধ পণ্ডিতরা এই সমুদ্রপথেই চীনে যেতেন। চীনা বিবরণী থেকে জানা যায় যে খ্রিস্টীয় দশ শতকের শেষভাগে এবং এগারো শতকের গোড়ার দিকে চীনরাজসভায় এত বেশী সংখ্যক ভারতীয় ভিক্ষু ছিলেন যা চীনের ইতিহাসে বিরল। এই সময়ে অল্প কিছুদিন পূর্বের এক চীনা বিবরণীতে দেখা যায় যে সে সময়ে ক্যান্টন নদী ভারত, পারস্য ও আরবের জাহাজে ভর্তি থাকতো। এই বিবরণী থেকে আরও জানা যায় যে কেবল মাত্র ক্যান্টনেই তিনটি ব্রাহ্মণ্য ধর্মের মন্দির ছিল এবং ভারতীয় ব্রাহ্মণরা সেইসব মন্দিরে বাস করতেন। চীনা সমুদ্রে ভারতীয়দের উপস্থিতি সম্বন্ধে জাপানী বিবরণীতেও পাওয়া যায়। ঐ বিবরণীতে আরও বলা হয়েছে যে দুজন ভারতীয় কালোস্রোতের সাহায্যে পৌঁছে জাপানে তুলার প্রবর্তন করেন। ভারতীয় রাজারা বিশেষ করে বঙ্গদেশের পাল ও সেন রাজারা এবং দক্ষিণভারতের পল্লব ও চোল রাজারা চীনা সম্রাটের নিকট পরপর দূত প্রেরণ করে ঐ দেশের সঙ্গে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রসারের ব্যবস্থা করেন। চীনের সঙ্গে এই ব্যবসায়ের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিল মালয় এবং তার প্রতিবেশী দেশগুলি। এই প্রতিবন্ধকতা দূর করবার জন্য চোলরাজ প্রথম রাজেন্দ্র ঐসব দেশগুলির বিরুদ্ধে নৌ অভিযান প্রেরণ করেন। যেসব দেশ সে সময়ে চীনের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য করতো তারা এত বেশী লাভবান হতো যার

Scanned by CamScanner

ফলে খ্রিস্টীয় তেরো শতকে চীনা সরকার চীন থেকে সোনা ও রূপা রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ করবার চেষ্টা করতে থাকেন। আরবীয় ও চীনদের বিরাট দ্রুতগতি জাহাজের সঙ্গে ভারতীয় জাহাজ পাল্লা দিতে পারতো না, তাই ক্রমে ভারতীয়দের ব্যবসায়ে মন্দা দেখা দিল। শোনা যায় যে চীনা জাহাজ গুলি ছিল বহুতল উচ্চ এবং ৪০০ সৈনিক ছাড়া ৬০০ যাত্রী বহন করতো। চীনা জাহাজের এত দ্রুত উন্নতির প্রধান কারণ ছিল দিক্‌নির্ণয় যন্ত্রের ব্যবহার। এই যন্ত্রের ব্যবহার চীন থেকে পশ্চিমে গেল খ্রিস্টীয় দশ শতকে। ভারতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে এর মধ্যেই পিছিয়ে পড়তে লাগলো।

এইরূপে দেখা যায় যে একদিকে পশ্চিমের দেশগুলির সঙ্গে ভারতীয় বাণিজ্যের বিলুপ্তি ঘটলো এবং আবার তার পুনরভ্যুত্থান ঘটলো খ্রিস্টীয় দশ শতকে আর অন্যদিকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও চীনের সঙ্গে ভারতীয় বাণিজ্যের দ্রুত প্রসার ঘটলো খ্রিস্টীয় বারো শতক পর্যন্ত। এই ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রধান ভূমিকা নিয়েছিল দক্ষিণ ভারত ও বঙ্গদেশ এবং এই সামুদ্রিক বাণিজ্যই ছিল সে সময়ের দক্ষিণ ভারত ও বঙ্গদেশের সম্পদ ও সমৃদ্ধির কারণ।

সমাজ

এই যুগে ভারতীয় সমাজে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এইসব পরিবর্তনের মধ্যে একটি হলো সমাজে এক বিশেষ শ্রেণীর ক্ষমতা বৃদ্ধি। সমসাময়িক লেখকরা এঁদের সামন্ত, রাণক, রাউগুা (রাজপুত) প্রভৃতি নামে অভিহিত করেছেন। এইসব শ্রেণীর উৎপত্তি হলো ভিন্ন ভিন্ন ভাবে। এঁদের মধ্যে কিছুজন ছিলেন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী। তাঁদের বর্ধিতহারে নগদ বেতন না দিয়ে তাঁদের রাজস্ব দেয় গ্রাম দেওয়া হতো। আর কিছুজন ছিলেন পরাজিত রাজারা ও তাঁদের অনুচরবর্গ। তাঁরা সীমিত অঞ্চলের রাজস্ব ভোগ করতেন। আবার কিছু সংখ্যক ছিলেন বংশপরম্পরায় স্থানীয় প্রধান অথবা সামরিক দুঃসাহসিক বীর। এইসব সমরকুশলী বীর সশস্ত্র অনুচরদের সহায়তায় নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে কর্তৃত্ব করতেন। এছাড়া ছিলেন উপজাতি ও গোষ্ঠী নায়কদল। এইসব শ্রেণীর প্রকৃত অবস্থা ছিল ভিন্ন ভিন্ন ধরনের। কেউ কেউ ছিলেন একটি গ্রামের প্রধান, কেউ কেউ বেশ কয়েকটি গ্রাম নিয়ে এক বৃহৎ এলাকার উপর কর্তৃত্ব করতেন আবার কেউ কেউ সমগ্র অঞ্চলের উপর আধিপত্য করতেন। এইরূপে এইসব প্রধানদের মধ্যে ক্রমোচ্চ স্তরবিভাগ ছিল। ফলে তাদের পরস্পরের মধ্যে অবিরত সংঘর্ষ বাধতো এবং সবাই তাঁদের কর্তৃত্ব ও অধিকারের সীমানা বৃদ্ধি করতে সচেষ্ট হতেন।

শাসকরা তাঁদের কর্মচারী এবং অনুচরদের যে রাজস্ব দেয় ভূখণ্ড ('ভোগ' বা

Scanned by CamScanner

'ফিফ' নামে অভিহিত) দিতেন তা ছিল অস্থায়ী ব্যবস্থা এবং সেই সব ভূখণ্ড শাসকরা ইচ্ছা করলে পুনরাধিকার করতে পারতেন। কিন্তু কার্যত সাক্ষাৎ বিদ্রোহ বা বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধে অভিযুক্ত না হলে কাউকে দেয়া ভূমি থেকে উৎখাত করা হতো না। এমন কি পরাজিত শাসককেও ভূমিচ্যুত করা তখন পাপ বলে মনে করা হতো।

এই ব্যবস্থার ফলে এ যুগে বিরাট অঞ্চল জুড়ে রাজ্যগুলির উপর কর্তৃত্ব করতেন পরাজিত ও অধীনস্থ শাসকরা। এই শাসকরা কিন্তু নিজ নিজ স্বাধীনতা পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য সব সময়ে সুযোগ খুঁজতেন। এইসব শাসকদের ভূখণ্ডের মধ্যে আবার বিভিন্ন ধরনের কর্মচারীও ভূমি ভোগদখল করতেন। তাঁরা এই ভূমির উপর বংশগত অধিকার দাবি করতেন। কালক্রমে বিভিন্ন সরকারী পদও বংশগত বলে বিবেচিত হয়। পূর্ব অধ্যায়ে বলা হয়েছে তিন পুরুষ ধরে একই পরিবারভুক্ত সদস্যরা মহামন্ত্রীপদ অলংকৃত করেছিলেন। একইভাবে বেশীর ভাগ সরকারী পদ কয়েকটি পরিবারের একচেটিয়া অধিকারভুক্ত ছিল। অধিকার প্রাপ্ত প্রধানরা ক্রমে সরকারের বহু দায়িত্ব পালন করতেন। তাঁরা কেবল ভূমি-রাজস্ব নিরূপণ ও সংগ্রহ করতেন তা নয়, ক্রমে শাসন সংক্রান্ত বহু ক্ষমতারও অধিকারী হয়েছিলেন। যেমন তাঁরা অপরাধীকে শাস্তি প্রদান করতে ও তার কাছ থেকে জরিমানা আদায় করতে পারতেন। তাঁরা নিজ নিজ এলাকায় গুপ্তধন ভাণ্ডার ও খনির উপর অধিকার দাবি করতেন। পূর্বে এসব রাজার সম্পত্তি বলে ধরা হতো। বংশপরম্পরায় প্রাপ্ত প্রধানরা আবার রাজার অনুমতি না নিয়েই তাঁদের অনুচরদের মধ্যে নিজ নিজ ভূমির অংশ ইজারা দিতেন। এইভাবে উৎপাদনে কায়িক শ্রম না দিয়ে বহু লোক ভূমি থেকে জীবিকার সংস্থান করতো। এই ধরনের সমাজকে সামন্ততান্ত্রিক সমাজ বলা যেতে পারে। এই সামন্ততান্ত্রিক সমাজের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো যে সমাজের প্রধান স্থানে রইলেন তাঁরা যাঁরা ভূমিতে কোন কায়িক শ্রম না দিয়ে ভূমি থেকেই জীবিকা নির্বাহ করেন।

ভারতে সামন্ততন্ত্রের বিকাশের ফল হলো সুদূরপ্রসারী। এই ব্যবস্থায় শাসকদের ক্ষমতা ও মর্যাদা হ্রাস পেল। তাঁরা সামন্তপ্রধানদের উপর অধিকতর নির্ভরশীল হয়ে পড়লেন। এই সামন্তদের মধ্যে অনেকেরই নিজেদের সৈন্য ছিল এবং এইসব সৈন্যের সাহায্যে তাঁরা শাসকদের প্রয়োজনবোধে প্রকাশ্যে বিরোধিতা করতেন। পরবর্তীকালে তুর্কীদের সঙ্গে লড়াইয়ে ভারতীয় রাজ্যসমূহের অভ্যন্তরীণ দুর্বলতাসমূহ স্পষ্ট হয়ে উঠলো। ছোট ছোট রাজ্যগুলি ব্যবসা-বাণিজ্যে উৎসাহ দিত না। এর পরিবর্তে গ্রামগুলি আলাদাভাবেই হোক্ বা সমষ্টিগতভাবেই হোক্ যাতে অধিকমাত্রায় আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠতে পারে সেদিকেই উৎসাহ দেওয়া হতো। সামন্ত-প্রধানদের আধিপত্য গ্রাম স্বায়ত্তশাসনকে দুর্বল করে দিল। অবশ্য সামন্তপ্রথা কেবলমাত্র দুর্গতির

কারণই হয়নি। কেননা বিশৃঙ্খলা ও দাঙ্গাহাঙ্গামার যুগে শক্তিশালী সামন্তপ্রধানরা কৃষক ও অন্যান্য দুর্বল শ্রেণীর ধনপ্রাণ রক্ষা করেছিলেন। নচেৎ সাধারণ জীবনযাত্রা স্তব্ধ হয়ে যেতো। তাছাড়া, কোন কোন সামন্তপ্রধান কৃষিকার্যের প্রসার ও উন্নতির ব্যবস্থায় উদ্যোগী হয়েছিলেন।

জীবনযাত্রার মান

এ যুগে ভারতীয় হস্তশিল্পের যেমন বস্ত্রবুনন, সোনা রূপার উপর কারুকার্য, ধাতুবিদ্যা প্রভৃতি উচ্চমানের কোন অবনতি ঘটেনি। ভারতীয় কৃষিও এ যুগে পূর্বের ন্যায় সমুন্নত ছিল। বহু আরব পর্যটকের বিবরণীতে ভারতীয় জমির উর্বরতা ও ভারতীয় কৃষকদের দক্ষতা সম্বন্ধে উল্লেখ দেখা যায়।

এ যুগের সকল সাহিত্য গ্রন্থে বর্ণিত বিবরণ থেকে জানা যায় যে এ যুগের মন্ত্রিগণ, উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা ও সামন্ত প্রধানরা অত্যন্ত জাঁকজমক ও সমারোহের মধ্যে বাস করতেন। রাজাদের অনুকরণে তাঁরাও চমৎকার গৃহ নির্মাণ করতেন। কখনো কখনো এই গৃহ তিন থেকে পাঁচ তলা পর্যন্ত উঁচু হতো। তাঁরা আমদানী করা উলের ও চীনা সিল্কের দামী বিদেশী পোশাক পরতেন, নানাবিধ প্রসাধন ব্যবহার করতেন এবং দেহের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করতে মূল্যবান রত্ন ও সোনা রূপার গহনা পরতেন। তাঁদের গৃহে থাকতো প্রচুর সংখ্যক স্ত্রীলোক এবং তাদের দেখাশুনা করার জন্য থাকতো বহু গৃহভৃত্য। যখন তাঁরা কোথাও বাইরে যেতেন বহু সংখ্যক পরিচারকও তাঁদের সঙ্গে যেতো। তাঁরা 'মহাসামন্তাধিপতি' এবং এই ধরনের বড় বড় উপাধি গ্রহণ করতেন। তাঁদের নির্দিষ্ট পতাকা ছিল, সুসজ্জিত ছত্র ছিল এবং মাছি তাড়াবার জন্য চামর ছিল। সমসাময়িক লেখায় একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারীর কনিষ্ঠ পুত্রের পোশাক-পরিচ্ছদ ও ধরন ধারণ সম্বন্ধে যে বর্ণনা পাওয়া যায় তা থেকে ছোটোখাটো ভূস্বামী ও উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীর জাঁকজমক ও আড়ম্বরপ্রিয়তার পরিচয় পাওয়া যায়। রাজকর্মচারীর পুত্রের হাতে ছিল একাধিক আংটি, কানে বিশেষ ধরনে দুল ও গলায় স্বর্ণসূত্র। জাফরাণ মাখার ফলে তাঁর গায়ের রঙ ছিল হরিদ্রাভ। তাঁর জুতোয় ছিল সুদৃশ্য নক্সা। তাঁর পোশাক ছিল জাফরাণ রঙে রঞ্জিত পীতবর্ণ এবং পোশাকের প্রান্তদেশে সোনার কাজ ছিল। তিনি যখন জনসাধারণের মধ্যে বাইরে আসতেন তাঁর সঙ্গে থাকতো বহু পরিচারক আর পাঁচ-ছয়জন রক্ষী। পরিচারকদের মধ্যে একজন পান-সুপারীর পাত্র নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে যেতো।

বড় বড় ব্যবসায়ীরাও রাজাদের ধরন ধারণ নকল করতেন এবং কখনো কখনো তাঁরা সম্পূর্ণ রাজকীয় জীবনযাপন করতেন। চালুক্য সাম্রাজ্যের জনৈক কোটিপতির সম্বন্ধে জানা যায় যে তাঁর গৃহের শীর্ষদেশে বাদ্যঘন্টাসহ বিরাট পতাকা শোভা পেত

Scanned by CamScanner

এবং বহু সংখ্যক ঘোড়া ও হাতীর তিনি মালিক ছিলেন। তাঁদের প্রধান অট্টালিকার পুরোভাগে থাকতো স্ফটিক নির্মিত সিঁড়ি। এই সিঁড়ি দিয়েই অট্টালিকায় পৌছানো যেতো। তাঁদের মন্দিরের মেঝে ছিল স্ফটিকের তৈরী এবং মন্দিরের দেওয়ালে ধর্মীয় চিত্র সব শোভা পেতো আর মন্দিরের দেবতার মূর্তিও ছিল স্ফটিক নির্মিত। গুজরাটের তদানীন্তন মন্ত্রিদ্বয় বাস্তুপাল ও তেজপাল সে সময়কার সবচেয়ে ধনী ব্যবসায়ী বলে খ্যাতিলাভ করেছিলেন।

উপরের বিবরণী থেকে এ ধারণা করা ভুল হবে যে দেশের সর্বত্র সুখ সমৃদ্ধি বিরাজ করতো। খাদ্যদ্রব্যের মূল্য তখন সস্তা ছিল বটে তবে নগরের বহু দরিদ্র লোক পেট ভরে খেতে পেতো না। খ্রিস্টীয় বারো শতকে কাশ্মীরে লিখিত 'রাজতরঙ্গিনী'র লেখক এই দরিদ্রদের কথা স্মরণ করে লিখেছেন যে রাজসভাসদগণ কষা মাংস খেতেন এবং পুষ্পসুরভিত ঠাণ্ডা মদ্য পান করতেন আর সাধারণ লোকেরা ভাত ও উৎপল শাক (একপ্রকার বন্য তিক্ত সব্জি) খেতো। তখনকার দরিদ্র স্ত্রী পুরুষের দুর্ভাগ্য বর্ণনা করে বহু গল্প আছে। দারিদ্র্যের জ্বালায় এদের মধ্যে অনেকেই দস্যু ও লুণ্ঠন বৃত্তি গ্রহণ করেছিল।

এরপর গ্রামের কথা। জনসাধারণের বিরাট অংশ গ্রামেই বাস করতো। তখনকার গ্রামের কৃষকদের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে নানা তথ্য পাওয়া যায় সেই সময়কার বহু সাহিত্যগ্রন্থে, ভূমি অনুদানে, শিলালিপি প্রভৃতিতে। ধর্মশাস্ত্র ব্যাখ্যাকারীরা বলেন যে পূর্বের ন্যায় তখনও কৃষকদের উৎপন্ন শস্যের এক-ষষ্ঠাংশ হারে ভূমি-রাজস্ব দিতে হতো। কিছু কিছু অনুদান থেকে জানা যায় যে ভূমি-রাজস্ব ছাড়া তাদের গোচারণ কর, পুষ্করিণী কর প্রভৃতি অন্যান্য অতিরিক্ত করও দিতে হতো। এছাড়াও অনুদানের গ্রাহককে কৃষকদের থেকে অন্য যে কোন কর আদায় করবার অধিকার দেওয়া হতো। কৃষকদের সামন্তদের গৃহে বেগার খাটতেও হতো। কয়েকটি ক্ষেত্রে যেমন মধ্যভারত ও উড়িষ্যায় দেখা যায় যে দানগ্রাহককে কয়েকটি গ্রাম পর্যন্ত দান করা হতো। এই গ্রামের সঙ্গে মধ্যযুগের ইউরোপের সার্ফদের মতো গ্রামের কারিগর, পশুপালক ও চাষীরাও পর্যন্ত দান গ্রাহকদের অধীনে আসতো। তখনকার সাহিত্যগ্রন্থে সামন্ত প্রধানরা প্রজাদের কাছ থেকে যে খুশীমত অর্থ আদায় করতো তার বিবরণ আছে। কথিত আছে যে জনৈক রাজপুত প্রধান এমন কি চড়ুই পাখী, মৃত পাখী, শূকর মল, শবাচ্ছাদন বস্ত্র প্রভৃতি থেকেও অর্থ উপার্জন করতেন। অপর একজন লেখক বলেন যে জনৈক সামন্ত প্রধানের কার্যাবলীতে একটা গোটা গ্রাম জনশূন্য হয়ে যায়।

এছাড়া সে সময়ে দেশে প্রায় দুর্ভিক্ষ ও যুদ্ধ লেগে থাকতো। জলাধার ধ্বংস করা, গ্রাম জ্বালিয়ে দেওয়া, গবাদি পশু ও বাজারের শস্যভাণ্ডার থেকে শস্য বলপূর্বক বাজেয়াপ্ত করা এবং নগরসমূহ ধ্বংস করা এসব ছিল যুদ্ধের সাধারণ বৈশিষ্ট্য বা

Scanned by CamScanner

সে যুগের লেখকদের মতে ন্যায্য অধিকার।

এইভাবে ভারতে সামন্ততান্ত্রিক সমাজের বিকাশে সাধারণ লোকের বোঝা বৃদ্ধি পায়।

বর্ণবিভাগ

বহু পূর্ব থেকে প্রচলিত বর্ণবিভাগ প্রথা ছিল মধ্যযুগের সমাজের ভিত্তি। এই যুগের স্মৃতিশাস্ত্রকাররা ব্রাহ্মণদের অধিকার ও প্রাধান্য নিয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছেন। এমন কি শূদ্রদের পক্ষে সামাজিক ও ধর্মীয় বিধিনিষেধ আরোপ প্রসঙ্গে এ যুগের স্মৃতিশাস্ত্রকাররা পূর্ব যুগের শাস্ত্রকারদেরও অতিক্রম করে যান। পরাশরের মতে শূদ্রের দেওয়া খাদ্যগ্রহণ, শূদ্রের সঙ্গে মেলামেশা করা, শূদ্রের সঙ্গে একসঙ্গে বসা এবং শূদ্রের নিকট থেকে পাঠ গ্রহণ মহত্তম ব্যক্তিকেও অধঃপতিত করে। শাস্ত্রে অস্পৃশ্যের ছায়া অপবিত্র কিনা এ বিষয়েও আলোচনা দেখা যায়। স্মৃতি লেখকদের নিয়মকানুন বিধিনিষেধ দৈনন্দিন জীবনে কতদূর পালন করা হতো তা বলা কঠিন। তবে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে নিম্নবর্ণের পক্ষে প্রযোজ্য বিধিনিষেধ এই যুগে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়। বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে বিবাহ এ যুগে নিন্দনীয় ছিল। সমসাময়িক লেখকরা বহু জাতির কথা উল্লেখ করেছেন যেমন কুমোর, তাঁতী, স্বর্ণকার, গায়ক, নাপিত, দড়ি-প্রস্তুতকারক, মুচি, জেলে, শিকারী ইত্যাদি। এদের মধ্যে কয়েকটি ছিল কর্মিসঙ্ঘ। এই কর্মিসঙ্ঘই এখন 'জাতি' শ্রেণীভুক্ত হয়েছে। এখানে লক্ষণীয় যে এ যুগের স্মৃতিশাস্ত্রকাররা হস্তশিল্পকে নিম্ন পেশা বলে গণ্য করতেন। এইভাবে বেশীর ভাগ শ্রমিক এবং ভীল প্রমুখ উপজাতি অস্পৃশ্য বলে গণ্য হতো।

এই সময়ে 'রাজপুত' নামে এক নূতন জাতি উত্তর ভারতে প্রাধান্য লাভ করে। রাজপুতদের উৎপত্তি নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্য বহু তর্কবিতর্ক আছে। বহু রাজপুত গোষ্ঠী নিজেদের মহাভারতে উল্লেখিত সূর্য ও চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় থেকে উদ্ভূত বলে মনে করে। আবার অন্যান্য কয়েকটি গোষ্ঠী দাবি করে যে রাজস্থানের আবু পাহাড়ে ঋষি অগস্ত্য কর্তৃক যজ্ঞের আগুন থেকে তাদের উৎপত্তি। যাইহোক্ এসব কাহিনী নির্ভরযোগ্য নয় কেননা আবু পাহাড়ে যজ্ঞের আগুন নিয়ে যে কিংবদন্তী তার প্রথম উল্লেখ পাওয়া খ্রিস্টীয় ষোল শতকে। এইসব কাহিনী থেকে এই সিদ্ধান্ত করা যায় যে বিভিন্ন রাজপুত গোষ্ঠী বিভিন্ন বংশ থেকে উদ্ভূত। বিদেশী ও ভারতীয় কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন যে বেশ কয়েকটি রাজপুত গোষ্ঠী সম্রাট হর্ষবর্ধনের পরে ভারতের যে সিথিয়ান ও হুণেরা বসবাস শুরু করে তাদেরই বংশধর আর অন্যান্য বেশীর ভাগ স্থানীয় কোন উপজাতি থেকে উদ্ভূত। বিভিন্ন সময়ে ক্ষত্রিয়দের সঙ্গে ব্রাহ্মণ ও বৈশ্য পরিবারও দেশে রাজত্ব করেছিলেন। মনে হয় কালক্রমে বিভিন্ন বর্ণের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন

Scanned by CamScanner

রাজপরিবার রাজপুত্র বা রাজপুত অর্থাৎ রাজবংশ নামে অভিহিত হন এবং তাঁদের ক্ষত্রিয়ের মর্যাদা দেওয়া হয়।

মোট কথা, এ যুগে যতটা মনে করা হয় ততটা জাতিভেদের কঠোরতা ছিল না। ব্যক্তি বা দল উচ্চবর্ণে উন্নীত হতে পারতো, আবার তাদের পতনের সম্ভবনা ছিল। কখনো কখনো বর্ণবিভাগে নতুন জাতিদের শ্রেণীবিভাগ করা কঠিন হয়ে উঠতো। যেমন এ যুগে কায়স্থ জাতির উল্লেখ দেখা যায়। মনে হয় মূলে ব্রাহ্মণ ও শূদ্র সহ বিভিন্ন জাতির যেসব লোক রাজকীয় সংস্থার কাজ করতো তাদের কায়স্থ বলা হতো। কালক্রমে পৃথক জাতি হিসাবে এদের আর্বিভাব ঘটে। এযুগে হিন্দু ধর্মের দ্রুত প্রসার হলো। হিন্দু ধর্ম যে কেবল বিরাট সংখ্যক বৌদ্ধ ও জৈনাদের নিজ সম্প্রদায়ভুক্ত করে নিয়েছিল তা নয়, এযুগে বহু স্থানীয় উপজাতি ও বিদেশীরা হিন্দুধর্ম গ্রহণ করেছিল। এই নূতন আগন্তুকেরা নূতন জাতি ও শাখা জাতি গড়ে তুললো এবং প্রায়ই তারা বিবাহে এবং নানা উৎসব অনুষ্ঠানে নিজেদের প্রথা ও আচারবিধি মেনে চলতো এবং এমন কি তাদের নিজেদের উপজাতীয় দেবদেবীদের মানতো। এইভাবে সমাজ ও ধর্ম ক্রমে জটিল থেকে জটিলতর হয়ে উঠলো।

Scanned by CamScanner

ও উৎসব ছাড়াও বাগানে প্রমোদ ভ্রমণ, দলবদ্ধ সাঁতার প্রভৃতি তখন জনপ্রিয় ছিল। বিভিন্ন পশুপাখীর মধ্যে লড়াই যেমন ভেড়ার লড়াই, মোরগ লড়াই এবং মুষ্টিযুদ্ধতে জনসাধারণ প্রচুর কৌতুক উপভোগ করতো। উচ্চশ্রেণীর মধ্যে পাশা খেলা, শিকার ও একপ্রকার পোলো খেলার চল ছিল। একপ্রকার ভারতীয় পোলো ছিল রাজাদের অবসর বিনোদনের মাধ্যম।

শিক্ষা ও বিদ্যাচর্চা

পূর্বযুগে যে শিক্ষাপদ্ধতির ক্রমবিকাশ ঘটেছিল মধ্যযুগেও তাই চালু ছিল। খুব বিশেষ একটা তার পরিবর্তন হয়নি। সে সময় জনশিক্ষার প্রচলন হয়নি। জীবিকার জন্য প্রয়োজনীয় বিদ্যাটুকু লোকে তখন শিখতো। প্রধানত ব্রাহ্মণ ও উচ্চবর্ণের কয়েকটি শ্রেণীর মধ্যেই লেখাপড়া সীমাবদ্ধ ছিল।

গ্রামে গ্রাম্য পুরোহিত বা ব্রাহ্মণ লেখাপড়া শেখাতেন। সাধারণত মন্দিরে শিশুদের পাঠশালা বসতো। অনুদান দেওয়া জমি থেকে এই পাঠশালার খরচ চলতো। পণ্ডিত ব্রাহ্মণদের জমি-অনুদান ধর্মীয় কার্য বলে গণ্য হতো। তাই তখন এ ধরণের প্রচুর অনুদান দেওয়া হতো। বহু সংখ্যক তাম্র অনুশাসনে এসব অনুদানের উল্লেখ দেখা যায়। কখনো কখনো মন্দিরে উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থাও হতো। সাধারণত উচ্চশিক্ষালাভের শিক্ষার্থীকে গুরুগৃহে থাকতে হতো। এর জন্য শিক্ষার্থীর নিকট থেকে গুরুমশায় বেতন পেতেন বা শিক্ষান্তে উপঢৌকন বা কোন দান পেতেন। সকল শিক্ষার্থীকে বিশেষ করে যারা দরিদ্র, বেতন দিতে পারতো না তাদের গুরুর ব্যক্তিগত কাজ করে দিতে হতো। পাঠ্য বিষয় প্রধানত ছিল বেদ, বেদাঙ্গ ও ব্যাকরণ। বর্ণমালার সঙ্গে শিশুকে সাধারণ গণিত শেখানো হতো। কিন্তু বিজ্ঞানচর্চায় তেমন উৎসাহ ছিল না। সে যুগে শল্য চিকিৎসার কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। সেতু নির্মাণ, বাঁধ তৈরী প্রভৃতির কার্য নিম্ন পেশা বলে গণ্য হতো। কেননা কায়িক শ্রমকে তখন মর্যাদার চোখে দেখা হতো না। কারিগরি বা বৃত্তি শিক্ষণের দায়িত্ব থাকতো বণিক সঙ্ঘের (Guild) বা নির্দিষ্ট পরিবারের উপর। যেমন কোন বণিক তার ছেলেকে ঐ বৃত্তিতে সযত্নে শিক্ষা দিচ্ছে তার বিশদ বর্ণনা পাওয়া গেছে। এই যুগে বিজ্ঞান বিষয়ে অধিকতর দক্ষতা অর্জনের জন্য এবং সাধারণ শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে পর্যটনের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হতো। একজন লেখক বলেন, যারা ভিনদেশের আচার-ব্যবহার, পোশাক-পরিচ্ছদ ও ভাষা সম্বন্ধে কিছু জানে না তারা যেন শিং-বিহীন ষাঁড়। তবে রাস্তাঘাটের বিপদ-আপদ, দস্যুভয় প্রভৃতির জন্য এমন কি ভারতের মধ্যে ভ্রমণ খুব সীমিত ছিল। ধনীরাই কেবল ভ্রমণে বেরোতে পারতেন।

মধ্যযুগে কয়েকটি বৌদ্ধবিহারে (মঠে) নিয়মমাফিক শিক্ষা দেওয়া হতো। এইসব

Scanned by CamScanner

বিহারে ধর্মবহির্ভূত বিষয়ের পঠন-পাঠনের উপর গুরুত্ব দেওয়া হতো। এইসব বিহারগুলির মধ্যে বিহারের নালন্দা ছিল সবচেয়ে বিখ্যাত। অন্যান্য শিক্ষাকেন্দ্র হিসাবে বিহারের বিক্রমশীলা ও উদন্তপুর উল্লেখযোগ্য। এইসব শিক্ষাকেন্দ্রে বহু দূর থেকে এমন কি সুদূর তিব্বত থেকেও শিক্ষার্থীরা আসতো। এইসব বিহারে শিক্ষা ছিল অবৈতনিক। এইসব প্রতিষ্ঠানের খরচ নির্বাহের জন্য রাজারা প্রচুর অর্থ ও জমি অনুদান দিতো। নালন্দা ২০০ গ্রামের অনুদান পেয়েছিল।

সে যুগে কাশ্মীরও এক গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাকেন্দ্র ছিল। কাশ্মীরে তখন বহু শৈব সম্প্রদায়ের উত্থান হয়েছিল এবং বিদ্যাচর্চার কেন্দ্রগুলি সুনাম অর্জন করেছিল। দক্ষিণ ভারতে মাদুরাই ও শৃঙ্গেরীতে বেশ কয়েকটি মঠ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। প্রধানত ধর্ম ও দর্শন বিষয়ে আলাপ-আলোচনা ও তর্ক-বিতর্কের প্রেরণা জোগাতো এইসব শিক্ষাকেন্দ্র। ভারতের বিভিন্ন অংশে নানা মঠ ও শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে মানুষের চিন্তা-ভাবনা ধ্যান-ধারণা দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বিনা বাধায় দ্রুত ছড়িয়ে পড়তো। কোন দার্শনিক পণ্ডিত যতক্ষণ না দেশের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন শিক্ষাকেন্দ্রের গিয়ে ঐসব শিক্ষাকেন্দ্রের পণ্ডিতগণের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা ও তর্ক-বিতর্কের মাধ্যমে আপন দর্শনের বিষয় সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারছেন ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁর শিক্ষা পূর্ণাঙ্গ হয়েছে বলে মনে করা হতো না। এইভাবে মানুষের ধ্যান-ধারণা সারাদেশে গতিপথ পেয়ে ভারতের সাংস্কৃতিক ঐক্য সুদৃঢ় করতে সাহায্য করেছিল।

যাই হোক, এযুগে পণ্ডিত ব্যক্তিদের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল অনমনীয়। পুরাতন বিদ্যার পুনরাবৃত্তিতেই ছিল তাঁদের আনন্দ, নূতন ধ্যান-ধারণাকে তাঁরা খুব একটা আমল দিতে চাইতেন না। ভারতের বাইরে বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা থেকেও তাঁরা নিজেদের বিচ্ছিন্ন রাখতে চাইতেন। মধ্য এশিয়ায় প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ও পণ্ডিত আলবিরুনী খ্রিস্টীয় এগারো শতকের প্রথম-দিকে ভারতে এসে প্রায় দশ বছর ছিলেন। তিনি তাঁর ভারত বিষয়ক বর্ণনায় ভারতীয় পণ্ডিতদের বিশেষ করে ব্রাহ্মণদের বিজ্ঞান বিমুখতা ও সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীর কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি নিজে অবশ্য ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি বলেন 'ভারতীয় পণ্ডিতেরা ছিলেন উদ্ধত, নির্বোধ দাম্ভিক, আত্মাভিমানী ও অবিচলিত। তাঁদের স্বভাব হলো যে তাঁরা তাঁদের অর্জিত জ্ঞান সকলের মধ্যে বিলিয়ে দিতে চাইতেন না, এ ব্যাপারে তাঁরা ছিলেন কৃপণ। বিদেশীদের তো দূরের কথা, নিজের দেশের ভিন্ন জাতের লোকেরা যাতে তাঁদের জ্ঞানের বিন্দুমাত্র অবগত হতে না পারে সে বিষয়ে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা বিশেষ সতর্ক ছিলেন। তাঁদের বিশ্বাস ছিল যে তাঁরা ব্যতীত অন্য কোন সৃষ্ট জীবের বিজ্ঞানবিষয়ক জ্ঞান ছিল না।'

জ্ঞানকে সীমিত গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখা ও নূতন চিন্তাধারা বা ধ্যান-ধারণাকে একেবারে আমল না দেওয়া—ভারতীয়দের এই যে সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী ভারতের

Scanned by CamScanner

অনগ্রসরতার প্রধান কারণ। এই অনগ্রসরতার জন্য কালক্রমে ভারতকে প্রচুর মূল্য দিতে হয়েছিল।

ধর্মীয় বিশ্বাস

মধ্যযুগে বৌদ্ধধর্ম ও জৈনধর্মের ক্রমাবনতি লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য দক্ষিণ ভারতে খ্রিস্টীয় দশ শতক পর্যন্ত জৈনধর্মের প্রসার অক্ষুণ্ণ ছিল। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম তার জন্মভূমি থেকে প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। আর সেই সঙ্গে হিন্দুধর্মের উল্লেখযোগ্য পুনরুত্থান ও প্রসার ঘটলো। হিন্দুধর্ম অবশ্য বিভিন্ন আকারে বিস্তার লাভ করলো। এর মধ্যে শিব ও বিষ্ণুর জনপ্রিয়তা লক্ষণীয়। এইসব দেবতার পূজাকে কেন্দ্র করে বেশ কয়েকটি জনপ্রিয় আন্দোলন মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো আর বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের মতবাদগুলি চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হলো। যথাসময়ে শিব ও বিষ্ণু প্রধান দেবতারূপে পরিগণিত হলেন এবং সূর্য ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবতার পূজার জনপ্রিয়তা হ্রাস পেলো। পূর্ব ভারতে এক নূতন ধরনের পূজার আরম্ভ হলো। এ হলো শক্তির পূজা, সৃষ্টির কারণ হিসাবে নারী শক্তির পূজা। এইরূপ বৌদ্ধরা প্রাচীন বুদ্ধ দেবতার সঙ্গিনী হিসাবে তারাদেবীর এবং হিন্দুরা শিবের সঙ্গিণী দুর্গা, সরস্বতী, কালী প্রভৃতি দেবীর পূজা আরম্ভ করলো।

খ্রিস্টীয় আট ও ন শতকে বৌদ্ধধর্ম কেবলমাত্র পূর্ব-ভারতেই সীমাবদ্ধ ছিল। পাল রাজারা বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। খ্রিস্টীয় দশ শতকের পর পাল শক্তির পতন ঐ অঞ্চলের বৌদ্ধধর্মের প্রতি আঘাত হানলো। তাছাড়া সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো যে এই সময়ে বৌদ্ধধর্মে অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। বুদ্ধ যে দর্শন প্রচার করেছিলেন তা ছিল ব্যবহারিক, তাতে পুরোহিতগিরি বা ভগবান সম্বন্ধে কল্পনার কোন স্থান ছিল না। খ্রিস্টাব্দের সূচনায় বৌদ্ধধর্মের মহাযান সম্প্রদায়ের উত্থান হলো। মহাযান মতে বুদ্ধ দেবতাজ্ঞানে পূজা করা হতে লাগলো। এই পূজা ক্রমে জটিল হতে লাগলো। মানুষের মনে বিশ্বাস জন্মালো যে মন্ত্র উচ্চাণ করে এবং যোগাভ্যাস করে পূজক তার কাম্যবস্তু লাভ করতে পারে। তাদের আরও বিশ্বাস হলো যে এই সব অভ্যাস এবং কঠোর আত্মসংযম ও গোপন আচার অনুষ্ঠানের দ্বারা তারা অতিপ্রাকৃত শক্তি অর্জন করতে পারে যেমন শূন্যে ওড়া, অদৃশ্য হয়ে যাওয়া, দূরের বস্তু দেখতে পাওয়া ইত্যাদি। এইভাবে মানুষ সকল সময়েই প্রকৃতির উপর আধিপত্য করতে চেয়েছে। আধুনিক বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতিতেই কেবল মানুষের এই সব আকাঙ্ক্ষা বহুলাংশে পূরণ হয়েছে। বহু হিন্দু যোগীও যোগাভ্যাস করতেন। তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে খ্যাতিলাভ করেছিলেন গোরখনাথ। গোরখনাথের অনুগামীদের 'নাথপন্থী' বলা হতো এবং এক সময়ে তাঁরা সমগ্র উত্তর ভারতে জনপ্রিয় ছিলেন। এই যোগীদের অনেকেই নিম্নবর্ণের ছিলেন। তাঁরা বর্ণবিভাগ ও ব্রাহ্মণদের অধিকারসমূহ স্বীকার করতেন না।

Scanned by CamScanner

নাথপন্থীরা ছিলেন তন্ত্রসাধক এবং জাতিবর্ণ নির্বিশেষে সকলের জন্য এই সাধনার পথ ছিল খোলা।

এইভাবে দেখা যায় বৌদ্ধধর্মের একেবারে বিলুপ্তি ঘটেনি কেননা এই ধর্মই ভিন্নরূপে প্রকাশ পেল এবং তা ছিল হিন্দুধর্ম থেকে অভিন্ন।

জৈনধর্ম পশ্চিম ভারতে বিশেষ করে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ে জনপ্রিয়তা অর্জন করে। গুজরাটের চালুক্য রাজারা জৈনধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এই সময়েই রাজপুতনার আবু পাহাড়ে দিলওয়ারা মন্দির প্রমুখ কয়েকটি সূক্ষ্ম কারুকার্যমণ্ডিত অতি চমৎকার জৈন মন্দির নির্মিত হয়েছিল। মালবের পরমার রাজারাও মহাবীর ও অন্যান্য জৈন সাধুদের বহু বিরাট মূর্তি নির্মাণ করেছিলেন এবং মহাবীর দেবতারূপে পূজিত হতেন। ভারতের বিভিন্ন অংশে বহু চমৎকার জৈননিবাস তৈরী হলো। সেই সব জৈননিবাস ভ্রমণকারীদের বিশ্রাম ভবনরূপেও ব্যবহৃত হতো।

খ্রিস্টীয় ন ও দশ শতকে দক্ষিণ ভারতে জৈনধর্ম সর্বোচ্চ প্রসার লাভ করে। কর্ণাটকের গঙ্গা রাজারা জৈনধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এই সময়ে দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন অংশে বহু জৈন বসদি (মন্দির) ও মহাস্তম্ভ (স্তম্ভ) নির্মিত হয়েছিল। শ্রবণবেলগোলায় বিরাট মূর্তি এই সময়েই স্থাপিত হয়। মূর্তিটি ১৮ মিঃ উঁচু এবং গ্রানিট শিলা কেটে তৈরী। জৈন সাধু দাঁড়িয়ে আছেন, কঠোর আত্মসংযমে রত, পায়ে সাপ জড়িয়ে গিয়েছে বা দেহে উইঢিবি দেখা দিয়েছে তাঁর ভ্রূক্ষেপ নেই। জৈন মতবাদের চারটি দান (বিদ্যা, খাদ্য, ঔষধ ও আশ্রয়) জৈনধর্মকে জনপ্রিয় করে তুলেছিল। কালক্রমে জৈনধর্মের কঠোরতা এবং রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতার অভাবের জন্য জৈনধর্মের অবনতি ঘটে। সেই সময়ে দক্ষিণ ভারতের পরপর কয়েকটি জনপ্রিয় ধর্মীয় আন্দোলন দেখা দিল। ফলে শিব ও বিষ্ণু পূজা জনপ্রিয় ধর্মীয় আন্দোলন দেখা দিল। ফলে শিব ও বিষ্ণু পূজা জনপ্রিয় হয়ে উঠলো এবং জৈনধর্মের জনপ্রিয়তা হ্রাস পেল। এই আন্দোলন 'ভক্তিবাদ' নামে খ্যাত। এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন নয়নার আর আলওয়ার নামে পরিচিত জনপ্রিয় সাধকরা। এইসব সাধক কঠোর আত্মসংযম বর্জন করলেন। তাঁরা বললেন ধর্ম আচারসর্বস্ব প্রাণহীন আনুষ্ঠানিক পূজা নহে, ধর্ম ঈশ্বর ও পূজকের প্রেমের প্রাণময় বন্ধন। এইসব সাধক তেলেগু ও তামিল ভাষায় ভক্তি প্রচার করতেন ও লিখতেন। ফলে জনসাধারণ সহজে তা বুঝতো। সাধকরা প্রেম ও ভক্তির বাণী প্রচারের জন্য এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যেতেন। এঁদের মধ্যে কয়েকজন ছিলেন নিম্নবর্ণের এবং কয়েকজন ব্রাহ্মণ। কয়েকজন মহিলা সাধকও ছিলেন। তাঁরা জাতিভেদ মানতেন না। অবশ্য তাঁরা এর বিরোধিতাও করেননি। বৈদিক শাস্ত্রপাঠ ও বৈদিক পূজা নিম্নবর্ণের পক্ষে নিষিদ্ধ। কিন্তু ভক্তিবাদের সাধকদের প্রদর্শিত ভক্তিপথ ছিল জাতি বর্ণ নির্বিশেষে সকলের জন্য উন্মুক্ত।

Scanned by CamScanner

ভক্তিবাদ কেবলমাত্র বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের অনুগামীদের হিন্দুধর্মে আকৃষ্ট করেনি, ধর্মীয় সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত নয় এমন অনেক উপজাতিকেও স্বমতে এনেছিল। এই যুগে বহু উপজাতি বর্ণভুক্ত হয়ে হিন্দুভাবাপন্ন হয়ে গিয়েছিল। সাধারণতঃ তারা তাদের উপজাতীয় পুরাতন দেবদেবীর পূজা করতো। এইসব দেবদেবী ক্রমে শিব ও বিষ্ণুর সঙ্গিনীরূপে গৃহীত হলো। এই সাংস্কৃতিক আত্তীকরণের ভূমিকায় লোককাহিনীর ভূমিকা অনস্বীকার্য।

খ্রিস্টীয় বারো শতকে লিঙ্গায়েত আন্দোলন নামে এক জনপ্রিয় আন্দোলন শুরু হলো। এই আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন বাসব ও তাঁর ভাগিনেয় চন্নাবাসব। তাঁরা কর্ণাটকের কলচুরী রাজসভায় ছিলেন। জৈনদের সঙ্গে তিক্ত বিবাদের পর তাঁরা তাঁদের মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করেন। লিঙ্গায়েতরা ছিলেন শিবের উপাসক। তাঁরা জাতিভেদ মানতেন না। উপবাস, ভোজ, তীর্থযাত্রা ও পশুবলি তাঁরা বর্জন করছিলেন। সামাজিক ব্যাপারে তাঁরা বাল্যবিবাহের বিরোধিতা করতেন এবং বিধবা বিবাহ সমর্থন করতেন।

এইভাবে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের দু ধারায় হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবন ও সম্প্রসারণ হলো। একদল বেদ এবং বৈদিক পূজাপদ্ধতির উপর নূতন করে জোর দিলেন, অপর দল উত্তর ভারতে তন্ত্রসাধনা এবং দক্ষিণ ভারতে ভক্তিবাদের কথা বললেন। প্রথম দলের আন্দোলন ছিল শক্তিশালী পুঁথিগত ও বুদ্ধিবাদের আন্দোলন আর দ্বিতীয় দলের আন্দোলন ছিল গণমুখী। তন্ত্র ও ভক্তি দুই বর্ণবৈষম্য উপেক্ষা করে সকলের জন্য দ্বার মুক্ত রেখেছিল।

এই সময়ে বুদ্ধিবৃত্তির দিক থেকে বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হলো। এই চ্যালেঞ্জ এলো শঙ্করাচার্যের কাছ থেকে। শঙ্কর হিন্দু দর্শনকে নূতন করে ব্যাখা করেন। সম্ভবতঃ খ্রিস্টীয় ন শতকে তিনি কেরলে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জীবনী সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। অবশ্য তাঁর জীবনী ঘিরে বহু লোককাহিনী প্রচলিত আছে। কথিত আছে যে জৈনদের অত্যাচারে তিনি মাদুরাই থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছেন। এরপর উত্তর ভারতে তিনি বিজয় অভিযান করে বিরোধীদের তর্কযুদ্ধে হারিয়ে নিজ মতবাদকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর জয়যাত্রা সম্পূর্ণ হলো যখন মাদুরাই ফিরে এলে রাজা তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন আর জৈনদের রাজ্য সভা থেকে নির্বাসিত করলেন।

এ কথা স্পষ্ট যে শঙ্করকে তাঁর মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য বৌদ্ধ ও জৈনদের প্রবল বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। শঙ্করের দর্শন, 'অদ্বৈতবাদ' বা 'দ্বিতীয়রহিত মতবাদ' নামে খ্যাত। শঙ্করের মতে ঈশ্বর এবং তাঁর সৃষ্ট জগৎ এক; পার্থক্য যা বাহ্যত প্রতীয়মান তারমূলে রয়েছে মানুষের অজ্ঞানতা। তাঁর মতে মুক্তির প্রধান উপায় হলো

জ্ঞান—ঈশ্বর ও তাঁর সৃষ্ট বস্তু এক ও অভেদজ্ঞান। ইহাই বেদান্ত দর্শন। শঙ্কর বললেন বেদই সত্যজ্ঞানের চরম উৎস।

শঙ্কর যে জ্ঞানের পথ দেখালেন তা সীমিত অল্পসংখ্যক লোকই অনুধাবন করতে পারলো। অর্থাৎ জনমানসে এর প্রভাব পড়লো না বললেই চলে। খ্রিস্টীয় এগারো শতকে সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত রামানুজ বেদের ঐতিহ্যের সঙ্গে ভক্তির অঙ্গীভূতকরণের চেষ্টা করলেন। তিনি বললেন যে মুক্তির জন্য ঈশ্বর সম্পর্কে জ্ঞান অপেক্ষা ঈশ্বরের করুণা অধিকতর প্রয়োজন। তিনি আরও বললেন যে—জ্ঞানের পথ নয়, ভক্তির পথই মুক্তির পথ এবং জাতিবর্ণ নির্বিশেষে এ পথ সকলের জন্য উন্মুক্ত। এইরূপে রামানুজ ভক্তিকেন্দ্রিক জনপ্রিয় আন্দোলন ও বেদভিত্তিক উচ্চবর্ণের আন্দোলনের মধ্যে এক সেতু রচনা করলেন।

রামানুজের পর মাধবাচার্য (খ্রিঃ দশ শতক) এবং উত্তর ভারতের রামানন্দ, বল্লভাচার্য বেশ কয়েকজন সাধক-দার্শনিক রামানুজের মতবাদ অনুসরণ করেন। এইভাবে খ্রিস্টীয় ষোল শতকের গোড়ার দিকে হিন্দু সমাজে সকল শ্রেণীর লোকের নিকট ভক্তিবাদ গ্রহণীয় হয়ে উঠে।

Scanned by CamScanner